বিবেকানন্দের সাহিত্যচর্চা

সুমিতা চক্রবর্তী

স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন অবশ্যই, কিন্তু কেবল সন্ন্যাসীই তিনি ছিলেন না। তিনি কেবল সমাজ-সংস্কারক নন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সমাজ-সংস্কারক। তিনি সমাজতত্ত্ববিদ হতে পারতেন। অনেকটা ছিলেনও, কিন্তু সমাজতত্ত্বের 'তত্ত্ব' অংশটায় খুব বেশি আগ্রহবোধ করেননি বলে তাঁকে সমাজতত্ত্ববিদ বলা গেল না। তাঁর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্যই সমাজতত্ত্ববিদ ছিলেন। বিবেকানন্দ ভূ-পর্যটক ছিলেন এবং ছিলেন সাহিত্যিকও। ছিলেন গভীরভাবে দেশপ্রেমিক এবং দেশব্রতী। বিবেকানন্দ ঈষৎ ভিন্ন পরিবেশ পেলে সঙ্গীতজ্ঞরূপেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। তাঁর মানবপ্রেমের কথা বলা নিতান্তই বাহুল্য।

সাহিত্যিক বিবেকানন্দ ছিলেন নিজস্ব প্রতিভার শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যদি তিনি ভারতের 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' না-ই হতেন তাহলে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস তাঁকে বাদ দিয়ে রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

সাহিত্যিক হতে গেলে আগে পাঠক হতে হয়। বিশেষভাবে সাহিত্যের পাঠন নয়, যে কোনও বিষয় নিয়ে পাঠের আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে জীবনকে জানবার আগ্রহ একজন লেখকের গড়ে ওঠার প্রথম সোপান। সেখান থেকেই শুরু হতে পারে সাহিত্যিক বিবেকানন্দকে জানবার প্রথম ধাপ।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। মোগল আমলে তাঁদের বংশ ছিল জমিদার। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে এই পরিবারের রামনিধি দত্ত উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে মধু রায়ের গলিতে বসবাস শুরু করেন। সেই বংশেরই বিশ্বনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথ। জননী ভুবনেশ্বরী দেবী। অকালমৃত ভাই-বোনদের বাদ দিলে সাত ভাই-বোনের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ। অপর দুই ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—দু'জনেই সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে ভূপেন্দ্রনাথ। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে ছিল তাঁদের বাড়ি। ঠাকুরদালান, বাগান, পুকুর, প্রশস্ত জমি, প্রাঙ্গন ও বৈঠকখানা সহ বাড়িটি ছিল যথেষ্ট বড়ো।

নরেন্দ্রনাথ তথা বালক বিলে-র লেখাপড়া শুরু হয় বাড়িতেই। তাঁর আর এক নাম ছিল বীরেশ্বর। সাহিত্যিক হতে গেলে একটি পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠা চাই। ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু অধিকাংশ সাহত্যিকেরই এই অভ্যাস গড়ে ওঠে বাড়িতেই। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন আইনজীবী। আর পাঁচজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের মতোই তাঁরও নিশ্চয়ই পড়া ছিল বাঙলা সাহিত্যের চিরায়ত কিছু গ্রন্থ—কৃত্তিবাস, কাশীদাসের রামায়ণ ও মহাভারত, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। পঠিত থাকা সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা। কিন্তু বিবেকানন্দের পাঠাভ্যাসের সূচনায় ছিল তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবীর ব্যক্তিত্ব। বিবেকানন্দের পরের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের বাল্যকালের অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটি লেখা

লিখেছিলেন। তেমনই একটি লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—"পূজনীয়া মাতা ভুবনেশ্বরীর পড়াশুনার একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল। দুপুরে কয়েক ঘণ্টা এবং রাত্রে কয়েক ঘণ্টা তিনি নিত্য পাঠ করিতেন। তাহা না হইলে তাঁহার অতি কষ্ট হইত। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি বিখ্যাত ছিল। গান বা কবিতা একবার মনোযোগ দিয়া শুনিলেই তাঁহার বেশ স্মরণ থাকিত। স্বামীজী তো প্রায়ই মায়ের কাছে শেখা ছড়া বা কবিতা আওড়াইতেন। পিতা ও মাতার বিদ্যাচর্চার বিশেষ অনুরাগ থাকায় সন্তানদের ভিতর বিদ্যাচর্চার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে।" (উদ্ধৃত : 'কলেজ স্ট্রিট' পত্রিকা বিবেকানন্দ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৮)।

এই লেখাটি থেকেই আমরা আরও জানতে পারি যে বালক বীরেশ্বর বিদেশি ভাষা বলে ইংরেজি শিখতে চাইতেন না। তাঁর ঝোঁক ছিল বাঙলা ও সংস্কৃত পড়ার দিকে। — "বীরেশ্বরের খুব শৈশবে খেয়াল ছিল যে, সে বাঙলা ও সংস্কৃত পড়িবে। ইংরাজী বিদেশি ভাষা ও ম্লেচ্ছ ভাষা, ওটা পড়িতে নাই। ... বীরেশ্বর যখন কিছুতেই ইংরাজী পড়িবে না ও বড় দুরন্তপনা আরম্ভ করিত, মা তখন তাহাকে নিজে পড়াইতে আরম্ভ করিতেন। তিনি বাঙলা পড়াইতেন, পরে ইংরাজীও শুরু করিলেন।" (পূর্বোক্ত লিখন)। এই লেখাতেই জানতে পারি যে 'পাদরী মেম মাস্টারনী' রেখে ইংরেজি শিখেছিলেন ভুবেনশ্বরী দেবী।

মহেন্দ্রনাথ দত্তের এই লেখাটি বিবেকানন্দের বাল্যজীবন জানবার পক্ষে আকর বিশেষ। আমরা তাঁর বিদ্যাভ্যাস সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরছি এখান থেকেই। সুকিয়া স্ট্রিট-এর বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রো পলিটন স্কুলে তিনি প্রথমে ভর্তি হলেন। দুরন্ত নরেন্দ্রনাথ পড়ার বই-এ বেশিক্ষণ মনোনিবেশ করতে পারতেন না কিন্তু তাঁর মেধা ছিল ক্ষুরধার। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মুখস্থ হয়ে যেত পাঠ্যাংশ। সংস্কৃত, ইংরেজি ও ইতিহাস তাঁর মনমতো বিষয় ছিল। গণিত তেমন ভালোবাসতেন না।

'কলেজ স্ট্রিট' পত্রিকার এপ্রিল ১৯৮৮ বিবেকানন্দ সংখ্যাতেই বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ 'নরেন্দ্রনাথের ছাত্র জীবনের গল্প' লিখেছেন। সেখানে দেখি অত্যন্ত দ্রুত এবং কম সময়ে তিনি শেষ করেছিলেন 'বিপুল কলেবর ইংলন্ডের ইতিহাস (Green's History of England)'।

স্কুলের পর্ব শেষ করে জেনারেল অ্যাসেমব্লি কলেজে বি.এ. পড়েন নরেন্দ্রনাথ। সেখানে তাঁর চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়তেন মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনি সতীর্থ বিবেকানন্দের স্মৃতি অবলম্বন করে লিখেছিলেন 'সতীর্থ স্মৃতি', প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯০৭-এ। ওই তরুণ বয়সেই বিবেকানন্দের অধ্যয়নের প্রকৃতি ও গভীরতার কিছু আভাস আমরা পাই এই লেখাটিতে। দুই প্রতিভাবান বন্ধু একে অপরকে সাহায্য করতেন লেখাপড়ায়। এই লেখাটি থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করে এই পাঠ-পরিধি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাবে। —

- "তখন আমরা দু'জনেই জেনারেল অ্যাসেমব্লি কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত, দার্শনিক ও কবি উইলিয়াম হেস্টির ছাত্র ছিলাম।"
- "জন স্টুয়ার্ট মিলের 'থ্রি এসেজ অন রিলিজন' তাঁর বালকোচিত ঈশ্বর ভক্তি ও সহজ

আশাবাদকে টলিয়ে দিয়েছিল।"

- "এক বন্ধু তাঁকে হিউমের নাস্তিক্যবাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ সম্পর্কে পড়তে বললেন। ফলে তাঁর ঈশ্বরে অবিশ্বাস দার্শনিক নাস্তিক্যবাদে রূপ নিল।"
- "(বিবেকানন্দ) ... সেই পরম সত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে আসার ব্যর্থতা ও অশান্তিকর সন্দেহের কথা জানলেন। মনের এই অবস্থায় আস্তিক্যবাদী দর্শন সম্পর্কে প্রথম শিক্ষানবীশের কি পাঠ্য তা জানতে চাইলেন। কিছু কিছু প্রামানিক বইয়ের নাম করলুম।"
- "আমি তাঁকে শেলির কিছু কবিতা পড়ালুম। দর্শন শাস্ত্রের যুক্তি পদ্ধতি তাঁকে অভিভূত না করলেও শেলির হিম টু দি স্পিরিট অব্ ইনটেলেকচুয়াল বিউটি, তাঁর সর্বেশ্বরবাদের অপৌরুষেয় প্রেম, তাঁর সহস্রবর্ষব্যাপী গৌরবময় মানবতার স্বপ্ন বিবেকানন্দকে অভিভূত করল।"

ব্রজেন্দ্রনাথের সাহচর্যে ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস ও হেগেল-এর লেখাও তিনি পাঠ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। আমরা বুঝে নিতে পারি যে, স্নাতক স্তরের ছাত্র থাকাকালীনই বিবেকানন্দ বিশেষভাবে ধর্মীয় দর্শন, যুক্তিবাদী দর্শন ও ইতিহাস—এই তিনটি বিষয়ে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখালেখির মধ্যে এই বিষয় তিনটি সম্পর্কেই চিন্তনের প্রগাঢ় অনুধ্যান আছে। কী কী বই তিনি পড়েছিলেন তার উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে তেমন পাওয়া যায় না। কিন্তু যে-সব বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন যত নিবন্ধ —তার মধ্যে এই তিনটি বিষয়ে তাঁর অতল জ্ঞান ও ভাবনার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সাহিত্য পাঠের অবলম্বন হিসেবে স্বতন্ত্র গ্রন্থের উল্লেখও তেমনভাবে কেউ করেননি। কিন্তু তাঁর লেখা একটু খুঁটিয়ে পড়লেই দেখা যায় বাঙলা ও ইংরেজি অনুবাদে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় রচিত ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থের সঙ্গেও পরিচয় ছিল তাঁর। সংস্কৃত সাহিত্য ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। তাঁর সমকাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে যা লেখা হয়েছে তা প্রায় সবই পড়েছিলেন তিনি। বিস্ময়কর প্রতিভার মানুষ ছিলেন। দ্রুত পড়তে পারতেন;পড়লে আর ভুলতেন না। পঠিত বিষয়-সমূহ তাঁর মানস-গঠনের অঙ্গীভূত হয়ে যেত। কখন পড়তেন, তা অনেক সময়ে শিষ্যরাও দেখতেই পেতেন না। বিবেকানন্দের নিজস্ব সাহিত্য-চর্চার নিদর্শন হাতে নিলেই চোখে পড়বে এই ব্যাপক অধ্যয়নের উপাদান কীভাবে মিশে আছে ছত্রে ছত্রে এবং অজস্র সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে।

অল্প বয়স থেকেই বিবেকানন্দের সাহিত্য পঠনের আর একটি অসাধারণ উৎস ছিল সঙ্গীত। ছোটো থেকেই সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর পিতাও ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। বাবার কাছেও গান শিখেছিলেন। মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে রাগাশ্রিত কাব্যগীতি তাঁর বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল। প্রাণ ঢেলে গাইতেন বাঙলা ও হিন্দি ভক্তিগীতি—ব্রহ্মসঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, ভজন। গানের টানেই ব্রাহ্ম সমাজের কাছাকাছি গিয়েছিলেন—একথা অনেকেই বলেছেন। বৈষ্ণবচরণ বসাককে সঙ্গী করে বাঙলা গানের বই 'সঙ্গীত কল্পতরু' সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি। বইটি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। ভূমিকায় স্বীকৃত হয়েছিল বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা।

বিবেকানন্দের সঙ্গীত পারদর্শিতার প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করছি না। কিন্তু তিনি আ-কৈশোর আকৃষ্ট ছিলেন কাব্যগীতিতে। গানের সুরের সঙ্গে বাণীর মিলনে যেসব সঙ্গীতের জন্ম। সুরের টানে ভুলে গানের ভাষা অনেকে খেয়াল করেন না। কিন্তু কাব্যগীতিতে সুরের সঙ্গে যোগ্য মিলনের প্রস্তুতিতে প্রকৃত গীতিকার গানের বাণীকে গভীর উপলব্ধি-স্পন্দিত করে তোলেন। গানের ভাষা অন্তরে গ্রহণ করবার শিক্ষা যাঁর থাকে তিনি অচিরেই অকৃত্রিম সাহিত্যবোদ্ধা হয়ে ওঠেন। বিবেকানন্দের সাহিত্যপাঠ এভাবেই সম্পূর্ণতা পেয়েছিল বলে মনে হয়।

বিবেকানন্দের সাহিত্য-চর্চার ভাষা-মাধ্যম বাঙলা ও ইংরেজি। তাঁর বহু ভাষণই ইংরেজিতে প্রদত্ত হয়েছিল। এখানে আমরা সেই ভাষণসমূহকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করছি না। বাঙলা ভাষায় রচিত তাঁর চারটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনাই আমরা এই নিবন্ধে অনুসরণ করব। এছাড়া তাঁর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান দিক—সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও গান ও কবিতা। কবিতার মধ্যে ইংরেজি কবিতাও আছে।

বাঙলায় লেখা নিবন্ধ-সংকলন ও ভ্রমণ কথামূলক চারটি গ্রন্থই মোটামুটি সম-সময়ে (১৮৯৮-১৯০২) রচিত। সব লেখাগুলির সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে 'উদ্বোধন' পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন বিবেকানন্দ স্বয়ং। তাঁর মতাদর্শেই পত্রিকাটির উদ্বোধন ঘটেছিল। বিবেকানন্দের এই কাজের মধ্যেও আমরা তাঁর সাহিত্যচিন্তার কিছু প্রতিফলন অনুভব করতে পারি। যদিও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনা প্রকাশের জন্য পত্রিকাটি পরিকল্পিত হয়নি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি। তার আগেও তৎকালীন মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দু'টি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলির মূলে ছিল বিবেকানন্দের প্রেরণা।

বিবেকানন্দের ধর্মীয় জীবন স্থানিক পরিসীমায় কোনওদিনই আবদ্ধ ছিল না। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি বারবার পরিক্রমা করেছেন ১৮৮৭ এবং ১৮৯৫-এ আমেরিকা, ইউরোপ ভ্রমণ। বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপের মননকেন্দ্রগুলিতে ভ্রমণ করে বিবেকানন্দের উপলব্ধি হয় যে, বড়ো মাপে কিছু করতে গেলে সে-সম্পর্কে নিজেদের ধ্যান-ধারণা, পরিকল্পনা এবং মতাদর্শকে আন্তর্জাতিক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এ কাজের প্রধান এবং প্রায় একমাত্র মাধ্যম হল পত্রিকার পৃষ্ঠা। এই উপলব্ধি থেকেই পত্রিকার পরিকল্পনা। পত্রিকাটির সাহায্যে বিবেকানন্দ কেবল রামকৃষ্ণদেবের মহিমা এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করতে চাননি। গভীরভাবে দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ তখনই সমগ্র ভারতকে অনুভব করেছিলেন অন্তরে। সাধন-ভজনের চেয়ে তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠতে শুরু করেছিল এই দরিদ্র, পরাধীন, সংস্কারাচ্ছন্ন দেশের সমস্যা মোচনের ভাবনা। তাই 'উদ্বোধন' পত্রিকা মঠ ও মিশনের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হলেও সেই পত্রিকায় ধর্মীয় মতাদর্শের সঙ্গেই সমভাবে প্রাধান্য পেল ভারতের ইতিহাস, ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বহু চিন্তন-সমৃদ্ধ রচনা। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, যে কোনও সুচিন্তিত সাময়িক পত্রের যা উদ্দেশ্য—তা-ই ছিল 'উদ্বোধন' পত্রিকারও উদ্দেশ্য।

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার নাম 'উদ্বোধন' লেখার নিচেই লেখা 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'। আরও লেখা ছিল : 'বাঙলা-পাক্ষিক-পত্র ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ক।'
এই ঘোষণাপত্র থেকেই বোঝা যায় যে, পত্রিকাটিতে রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মীয় মতাদর্শের সঙ্গেই আরও বহু বিষয়ের প্রবন্ধ মুদ্রিত হত। বিশেষ করে প্রবন্ধ, ভ্রমণ কথা এবং কবিতার স্থান ছিল উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।

যে চারটি গদ্যগ্রন্থকে বিবেকানন্দের গদ্যসাহিত্যের প্রধান সম্ভার বলে মান্য করা হয় তার মধ্যে 'ভাববার কথা' প্রবন্ধগুচ্ছের প্রধান পরিচয় হল পরাধীন ভারতের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত মোট নয়টি প্রবন্ধের সংকলন। এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল 'উদ্বোধন'-এর প্রথম প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে। নয়টি প্রবন্ধ যথাক্রমে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি', 'ঈশা-অনুসরণ', 'বর্তমান সমস্যা', 'বাঙ্গালা ভাষা', 'জ্ঞানার্জন', 'ভাববার কথা', 'পারি-প্রদর্শনী', 'শিবের ভূত'।

প্রবন্ধগুলির দিকে একটু চোখ রাখা যাক। প্রথম প্রবন্ধ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ'। এটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭) রামকৃষ্ণের পঁয়ষট্টি বছরের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে। কিন্তু তখন লেখাটির নাম ছিল 'হিন্দুধর্ম কি?'। বস্তুত সমগ্র রচনাটিতে রামকৃষ্ণের নাম আছে একবার মাত্র। সেই বাক্যটি দীর্ঘ, জটিল এবং যৌগিক। উনিশ শতকের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ অনেক সময়েই এই ধরনের ভাষায় লেখা হত। একে বলা যেতে পারে সংস্কৃত ভাষায় প্রলম্বিত বাক্য-সমাহার শৈলীর উত্তরাধিকার। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা অনেকেই এই শৈলীতে বাঙলা লেখা শুরু করেছিলেন।

"তখন আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত বিবদমান আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা বিভক্ত, সর্বথা প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তি স্থান ও বিদেশির ঘৃণাসম্পদ হিন্দু-ধর্ম নামক যুগযুগান্তর ব্যাপী দ্বিখন্ডিত ও দেশকাল যোগে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ধর্মখন্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় এবং কালবেশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের পারলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

কিন্তু বাক্‌শৈলীটি পুরনো ধরনের হলেও, হিন্দুধর্মের চেহারা কোন্ আকার নিয়েছে তা দ্বিধাহীন ভাবে ব্যক্ত করেছেন বিবেকানন্দ। আত্মসমালোচনায় সেখানে তিনি অকুণ্ঠ। গতানুগতিক হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীদের মতো হিন্দু ধর্মের সবকিছুকেই অন্ধভাবে সমর্থন করবার কোনও চেষ্টাই তিনি করেননি। বিবেকানন্দের যে কোনও লেখার মূল শক্তিই ছিল এই চিন্তা-স্বাতন্ত্র্য। নিজের মতো চিন্তা ও স্পষ্ট সাহসে সেই চিন্তাকে ব্যক্ত করার প্রবণতা।

এই প্রবন্ধের শেষের দিকে বিবেকানন্দ জীর্ণ ও প্রাচীন প্রথার মোহে আবদ্ধ না থেকে ভারতবাসীকে নবধর্মে প্রাণিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সময়ে তাঁর ভাষাভঙ্গিও সবলে ছিন্ন করেছে পুরনো লিখনশৈলীর ছাঁচ। যে কোনও লেখাই সাহিত্য হয়ে উঠতে সক্ষম হয় যদি

লেখকের জীবন বিশ্বাস ও আত্মিক আদর্শ সেই লেখায় প্রাণিত হয়ে ওঠে। প্রবন্ধটির শেষের আগের অনুচ্ছেদে আমরা শুনতে পাই সেই প্রাণের ভাষা।

"মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গত রাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীবন দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।" — ছোটো ছোটো, দৃঢ়বদ্ধ, স্পষ্টার্থক বাক্যগুলির বিন্যাসে যেন বিবেকানন্দের চরিত্রটিকেই মূর্ত দেখতে পাই। বিবর্ণ ও নিষ্প্রাণ জাতিকে যেন দু-হাত বাড়িয়ে আহ্বান করছেন কর্মজগতের কেন্দ্র ভূমিতে। লক্ষণীয় যে, এই আহ্বান কালে তিনি — 'হিন্দু' বা 'বাঙালি' বলে সম্বোধন করেননি কাউকে। তাঁর ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান হয়ে উঠেছে 'ভারতবর্ষ' শব্দটি। বিবেকানন্দের সাহিত্য চিন্তনে এই ভারতীয়ত্ববোধ হিন্দুত্ববোধকে প্রায়ই ছাপিয়ে গেছে। মানুষ ও সাহিত্যিক বিবেকানন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই মানস-বিস্তার।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি অধ্যাপক ম্যাক্স্‌ম্যুলার রচিত 'দা লাইফ অ্যান্ড সেইংস্ অফ্ রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের একটি পর্যালোচনা। ম্যাক্সম্যুলার রামকৃষ্ণ সমালোচকদের অভিমত যেভাবে খণ্ডন করেছেন তার প্রশংসা করেছেন বিবেকানন্দ। এখানেও নির্দিষ্ট গ্রন্থ ছাপিয়ে বর্তমান (উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে) ভারতবাসীদের প্রতি বিবেকানন্দের দৃষ্টি প্রসারিত।

'ভাববার কথা' গ্রন্থের তৃতীয় রচনাটি বিবেকানন্দের অধ্যয়ন-স্পৃহা, অধ্যাত্ম উপলব্ধির সঙ্গে জীবনের মঙ্গলকর্মের আদর্শকে সম্মিলিত করবার স্বাভাবিক প্রবণতা, উদার ধর্মীয় মনোভাব এবং তরুণ বয়স থেকেই কঠিন কর্মে প্রবৃত্ত হবার মানসিকতার সম্মিলিত দৃষ্টান্ত। 'ইমিটেশন অফ্ ক্রাইস্ট' নামক লেখক পরিচয় বিহীন গ্রন্থটি সামগ্রিকভাবে খ্রিস্টীয় বিশ্বে এবং বিশেষভাবে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। পরবর্তীকালে গবেষকরা অনুমান করেছেন যে, টোমাস আ কেম্পিস নামক রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী এ গ্রন্থের লেখক। 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামক পত্রিকায় ১২৯৬ বঙ্গাব্দে (১৮৮৯) বিবেকানন্দ এই বইটির বাঙলা অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষের পাঁচটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ছয়টি পরিচ্ছেদ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সূচনা অংশটি তাঁর নিজের লেখা। এই রচনাংশগুলি একত্রে 'ভাববার কথা'-র তৃতীয় প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত। এমন একটি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত হবার মূলে জ্ঞানস্পৃহা, বিশ্ব-ধর্ম সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবার আকাঙ্ক্ষা থাকে যা একজন লেখককে গড়ে ওঠবার প্রেরণা দেয়। পরাধীন ভারতে বসে এই কাজটি তিনি করেছেন বলে যদি কেউ তাঁকে শাসক-অনুরাগী মনে করেন তাহলে তাঁকে পাঠ করতে বলব সূচনা লিখনের দুটি অংশ।

১। "যে মহাপুরুষের জ্বলন্ত জীবন্ত বাণী আজি চারি শত বৎসর কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় অদ্ভুত মোহিনী শক্তিবলে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভা ও সাধনবলে কত শত শত সম্রাটেরও নমস্য হইয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক পবিত্রতার নিকটে পরস্পরে সতত যুধ্যমান অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত খ্রীষ্ট-সমাজ চিরপুষ্ট বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত

করিয়া রহিয়াছে—তিনি এ পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই।"

২। "এখন আমরা খ্রীষ্টিয়ান রাজার প্রজা। রাজ-অনুগ্রহে বহুবিধ নামধারী স্বদেশী বিদেশি খ্রীষ্টিয়ান দেখিলাম। দেখিতেছি, যে মিশনারী মহাপুরুষেরা 'অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার জন্য ভাবিও না' প্রচার করিয়া আসিয়াই আগামী দশ বৎসরের হিসাব এবং সঞ্চয়ে ব্যস্ত—দেখিতেছি, 'যাঁহার মাথা রাখিবার স্থান নাই' তাঁহার শিষ্যেরা—তাঁহার প্রচারকেরা বিলাসে মন্ডিত হইয়া, বিবাহের বরটি সাজিয়া, এক পয়সার মা-বাপ হইয়া ঈশার জ্বলন্ত তাগ, অদ্ভুত নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান দেখিতেছি না।"

এই দু'টি উদ্ধৃতি থেকে বিবেকানন্দের স্পষ্টবাদিতা এবং তার মূলে তাঁর সুস্পষ্ট, নির্ভীক ও সমুন্নত চিন্তার যে স্বাক্ষর পাই তারই জোরে প্রথাসিদ্ধ অর্থে সাহিত্যিক না হয়েও সাহিত্যিক রূপে তিনি স্বয়ংসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

চতুর্থ প্রবন্ধ 'বর্তমান সমস্যা' উদ্বোধন পত্রিকার প্রস্তাবনা রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। বিবেকানন্দ বস্তুত মনোধর্মে ঠিক সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁর জীবনাচরণেও তার প্রমাণ আছে। তিনি ছিলেন প্রাণের আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী এক দেশব্রতী, আদ্যন্ত দেশপ্রেমিক ভারতীয়। তাঁর সেই হৃদয়ই উন্মুক্ত হয়েছে এই লেখাটিতে।

"যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমন্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদ মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।" সত্ত্ব গুণের চেয়ে রজোগুণকে জাতির জন্য অধিকতর শ্রেয় মনে করেছিলেন বিবেকানন্দ।

পঞ্চম প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ভাষা' নিঃসংশয়েই প্রতিষ্ঠিত করে এই সত্য যে, লেখ্য বাঙলায় স্বচ্ছন্দ চলিত ভাষার প্রবর্তক, প্রমথ চৌধুরী নন, বিবেকানন্দ। আমেরিকা থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি এই চিঠি লিখেছিলেন তিনি 'উদ্বোধন' সম্পাদককে। লেখাটি চলিত ভাষায় এবং চলিত ভাষার সমর্থনে ঝলমল করে। যুক্তির বিন্যাসেও তিনি প্রথম সারির প্রাবন্ধিক। সংস্কৃত ভাষা সাধারণ জনের আয়ত্তে নেই। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—সকলেই সরলভাষায় লোকশিক্ষা দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাষাই জাতির উন্নতির সোপান। ভাষার অলংকরণ নয়, ভাবের সমৃদ্ধিই হল প্রধান বিবেচ্য। এসব কথাই সংক্ষেপে পরিষ্কার করে বলেছেন লেখক। বহুল আঞ্চলিক ভাষা-ছাঁদের মধ্যে সর্বমান্য বা 'স্ট্যানডার্ড' বাঙলা ভাষা কী হবে তা প্রমথ চৌধুরীর অনেক আগেই নির্দেশ করে গেছেন তিনি।

"প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়।" চলিত ভাষা ভাবনার প্রথম পথিকৃৎ বিবেকানন্দই, চিন্তায়

এবং কাজে—তাতে কোনও সংশয় নেই।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'জ্ঞানার্জন'—দর্শন ভাবনা সমৃদ্ধ একটি লেখা। সপ্তম রচনা 'ভাববার কথা' সাতটি টুকরো চিন্তা-খন্ডের সমষ্টি। প্রথমটি ছাড়া বাকি ছয়টি চলিত ভাষায় লেখা। ধর্মের আচরণ, আড়ম্বর, লোকাচার ভেদ করে তার সারটুকু স্পর্শ করার শিক্ষা সরস ভঙ্গিতে দিয়েছেন লেখক। ঈষৎ হুতোমি ভাষার ছায়া আছে। অষ্টম প্রবন্ধটি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দের প্যারিস পর্যটনের বিবরণ। প্যারিস-এ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বসেছিল ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে এক বৃহৎ সভা। নাম ছিল 'কংগ্রে দ' লিস্তোয়ার দে রিলিজিওঁ' [Congress of the History of Religions, August 1900]। এই অধিবেশনে একাধিক ভাষণ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। সেই অধিবেশনগুলির বিবরণ তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন তৃতীয় ব্যক্তির জবানিতে। ধর্ম-শাস্ত্র-জ্ঞানের দিক থেকে নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। সুবিন্যস্ত যৌক্তিক বিন্যাসও পাঠককে প্রীত করবে।

'ভাববার কথ' গ্রন্থের শেষ লেখাটি একটি অসমাপ্ত গল্প। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর ঘরের কাগজপত্রের মধ্যে এটি পাওয়া গিয়েছিল। সেই মতো টীকা-সমেত 'শিবের ভূত' নামক অসমাপ্ত গল্পটি মুদ্রিত হয়েছে 'উদ্বোধন'-এ। এক জার্মান ব্যারন তাঁর ভগ্নির গৃহত্যাগের ফলে শোকার্ত। নিজের বিবাহও স্থগিত রেখেছেন। তাঁর মন ভালো করবার জন্য শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ ছিল প্যারিস-এ শিল্প প্রদর্শনী দেখার জন্য ব্যারণ যাবেন। সেই মতো ব্যারন প্যারিস যাত্রা করলেন। গল্পটি এ পর্যন্তই লেখা হয়েছে। গল্পের নামের সঙ্গে আখ্যানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করবার আগেই বিবেকানন্দের দেহান্ত ঘটেছিল। এটুকুই বলা যায়, ইচ্ছে করলে বিবেকানন্দ ছোটো গল্পকারও হতে পারতেন।

কালক্রম অনুসারে বিবেকানন্দের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরিব্রাজক'—অসামান্য মনন-দীপ্ত এবং একই সঙ্গে সরস একটি রচনা। বাঙলা সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রয়োগের দিক থেকেও যুগান্তকারী এক সৃষ্টি।

'পরিব্রাজক' নামের বইটি লেখা হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের বিবরণ অবলম্বন করে। প্রত্যক্ষ উপলক্ষ্য ছিল সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এই ভ্রমণ কথা লেখবার অনুরোধ। সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পরিকল্পনা অনুসারে 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় রচনাটি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের মধ্যে। তখন লেখাটির নাম ছিল 'বিলাত যাত্রীর পত্র'। সম্পাদককে লিখিত পত্রের আকারে রচিত হয়েছিল এই নিবন্ধগুলি। বিবেকানন্দের প্রয়াণের (১৯০২) পরে স্বামী সারদানন্দের সম্পাদনায় লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-ভূমিকায় তারিখ প্রদত্ত ছিল মাঘ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ। পরিবর্তিত গ্রন্থ-শিরোনাম সুপ্রযুক্ত হয়েছে—এ-কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

এই রচনাটি কথ্য ভাষায় রচিত। কেবল এই সংবাদটুকুই বিবেকানন্দের সরল, সাহসী, সংস্কারমুক্ত ও বহুমুখী চিন্তনে অভ্যস্ত মনের গঠন অনুভব করা যায়। যে-সময়ে এই রচনাটি প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকায়, তখন চিন্তামূলক গদ্য এবং কথাসাহিত্যের গদ্য সাধু বাঙলা ছিল। তার

অন্যথা প্রায় হত না। এমনকি, চিঠিপত্রও সাধু বাঙলা ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যবহার করেই লেখা হত। মুখের ভাষার কথ্য বাঙলাকে একটু অবজ্ঞা ও তুচ্ছতার দৃষ্টিতেই দেখা হত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক রচনা ছাড়া শোভন-রুচি, বিষয়-গৌরবমূলক কোনও লেখাই লেখা হত না কথ্য বাঙলায়। প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠীর চলিত ভাষার সপক্ষে আন্দোলনের কাল এই সময়ের অন্তত বারো বছর পরে দেখা দেয়। গল্প-উপন্যাসের সংলাপও লেখা হত সাধু বাঙলা গদ্যে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল নাটকের সংলাপ। তাও অনেক নাটকে সমাজের তথাকথিত 'উচ্চ'বর্গের চরিত্রের ভাষা রূপে সাধু ও সংস্কৃত বহুল গদ্যই ব্যবহৃত হত। স্বল্পশিক্ষিত নারী ও নিম্নবর্গের মানুষের সংলাপ লেখা হত কথ্য বাঙলায়। কিন্তু প্রবন্ধ-জাতীয় লিখনের জন্য কথ্য বাঙলার প্রয়োগ ছিল অ-কল্পিত।

সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে বাঙলা লিখন-পঠনের জগতে কথ্য চালের বাঙলা গদ্যকে নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে ব্যঙ্গ-কৌতুকমূলক লেখার অভিব্যক্তির ভাষারূপে। সেই কথ্য ভাষায় লেখকেরা মিশিয়ে দিয়েছেন কিছু স্থূল রুচির আতিশয্য। শিক্ষিত ভদ্র-সমাজে অবাধে উচ্চারিত হয় না—এমন শব্দের প্রবেশাধিকার ঘটেছে সেখানে। তৎসম শব্দের তুলনায় প্রচল-তদ্ভব, অতি প্রাত্যহিক, দেশজ ও বিদেশি শব্দের সেখানে প্রাবল্য। গাম্ভীর্যের শোভন মন্ত্রধ্বনি ফোটে না সে-ভাষায়। এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র অভিযোগ করেছিলেন—"হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই, হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতাশূন্য।" (প্রবন্ধ: বাঙ্গালা ভাষা)।

বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত আমরা কখনই মানব না। বহু পঠিত এই গ্রন্থের অংশ উদ্ধার করতে এখন আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু অপূর্ব চিত্রময়, অদ্ভুত গতিশীল, বাস্তব-সরস ও সকৌতুক দৃষ্টিকোণের প্রক্ষেপনে বর্ণময়, প্রয়োজনে শল্যবিদের সুক্ষ্মাগ্র ছুরির মতো শানিত; এবং সময়ে সময়ে কবিতার মতোই এই হুতোমি ভাষা। কিন্তু যে বার্তাটি এখান থেকে তুলে নিতে চাই তা হল কথ্য ভাষাকে আলাদা রাখা হয়েছিল এমন রচনার জন্য যা তৎকালীন রুচিতে শোভন-শালীন বলে গণ্য হবে না। ব্যঙ্গ-কটাক্ষের সঙ্গে প্রায়শই যে চটুলতা এবং সময়-বিশেষে কিছু অশ্লীলতা মিশে যায় তা এই ভাষায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কথ্য বাঙলা ভাষায় যেন এই জাতীয় সামাজিক বিদ্রূপই রচিত হবে, তার চেয়ে গভীরতর কোনও অন্তরের বাণী ঘোষিত হবে না।

এই ভাষা-সংস্কার উন্মুলিত করে দিলেন বিবেকানন্দ। তিনি কথ্য বাঙলার বাক্-চাল ও সরল ভঙ্গিটিকে ছড়িয়ে দিলেন পরিব্যাপ্ত প্রয়োগের প্রাঙ্গণে। এই কথ্য বাঙলায় তিনি কেবল তাঁর সমুদ্র-পথের জাহাজ-ভ্রমণের সরস বিবরণই দিলেন না, এই ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করলেন ইতিহাস; বিশ্লেষণ করলেন বিজ্ঞান; তুলনামূলক সমালোচনা করলেন ভারত ও অন্যান্য দেশের সমাজের; আলোচনা করলেন ধর্মতত্ত্ব, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি—কী নেই তাঁর 'পরিব্রাজক'-এর পেটিকায়! এই লিখন এক জ্ঞানভান্ডার বিশেষ। কোথাও পরিহাসের কবিতা। সবই কথ্য বাঙলা ভাষায়। চলিত বাঙলা ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম প্রয়োগে, বাঙলা বাগ্‌ধারার সজীব বিন্যাসে।

লক্ষণীয় যে 'নববাবু বিলাস' লেখার সময়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রমথনাথ শর্মা' ছদ্মনাম নিয়েছিলেন; 'আলালের ঘরের দুলাল' রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্রের স্বনামে পরিচিতির পথে আড়াল ছিল 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামের;কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখেছিলেন 'হুতোম প্যাঁচা' নাম নিয়ে। এত ছদ্মনাম কেন? ব্যঙ্গ-সরল কথ্য ভাষায় সমাজ-চিত্র খুলে দেখাতে একটুখানি সংকোচ ছিল কি? নিজেকে স্বনামে প্রকাশ করতে কিছু কুণ্ঠা?

বিবেকানন্দের কোনও সংকোচ ছিল না। তখন ভারত বিখ্যাত সন্ন্যাসী। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর বহু মানুষ তাঁকে জানেন। রামকৃষ্ণ মঠের মুখপত্র 'উদ্বোধন'—বহু বিদগ্ধজনের কাছে ও ভক্তজনের কাছে পৌঁছে যাবে সেই পত্রিকা। সেই পত্রিকায় নিজের নামে চলিত বাঙলায় নিজের মনের কথা মেলে ধরলেন বিবেকানন্দ। এই ভাষাপথের খননে তাঁর পূর্বসূরী কেউ ছিলেন না। চলিত বাঙলা ভাষাকে সর্বপ্রকার রচনার মাধ্যম করে তোলবার কাজে বাঙলা সাহিত্যে প্রথম অগ্রদূত বিবেকানন্দ। প্রমথ চৌধুরীর ভাবনা-চিন্তা আর 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠীর প্রয়াস, আগেই বলেছি, চোদ্দ বছর পরে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

'পরিব্রাজক'-এর প্রায় সমকালে রচিত এবং 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'ও চলিত বাঙলায় লেখা। অবশ্য সমকালেই লিখিত অপর একটি রচনা 'বর্তমান ভারত' লেখার সময়ে বিবেকানন্দ সাধু বাঙলাই ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্রেও দেখা যায়—চলিত ও সাধু—দুই ধরনের বাঙলা ভাষাই ব্যবহৃত। কিন্তু যখন বিবেকানন্দ সাধু বাঙলা গদ্য লিখেছেন তখনও ভাষা-ভঙ্গির সারল্য, স্পষ্টতা ও ঋজুতা পরিহার, অতিরিক্ত অলঙ্কৃত ভাষা ও ভাষার কৃত্রিম সাজসজ্জা পছন্দ করেননি কখনও। প্রমথ চৌধুরীর আদর্শ চলিত ভাষায় যে সচেতন কারিগরি, যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, উইট, পান-এর চারু-বিন্যাস দেখি—বিবেকানন্দের চলিত বাঙলার আদর্শ তা ছিল না। বোধহয় আজ স্বীকার করবার সময় এসেছে—আজ এই মুহূর্তে যে ভাবনামূলক গদ্য বাঙলা চলিত ভাষায় লিখিত হচ্ছে তার প্রথম উৎসের সন্ধান বিবেকানন্দের এই 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-র মধ্যে পাওয়া যায়।

'পরিবাজক' গ্রন্থটি এক অসাধারণ মানুষের চলার পথে অভিজ্ঞতার লিপিমালা। প্রথম ছত্র থেকেই লেখাটি ছড়াতে থাকে মুগ্ধতা। আমরা সেই আশ্চর্য মানুষটির মনের সন্ধান নেবার চেষ্টা করব এখন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ-ই উদ্ধৃতিযোগ্য। আমরা কেবল এক একটি দিকের উল্লেখ করব এবং সঙ্গে তুলে দেব একটি করে অংশ—বিবেকানন্দের নিজের লেখায়।

পরিব্রাজক-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পর্যবেক্ষণ-শক্তি। বিবেকানন্দের পর্যবেক্ষণে অনুপুঙ্খতার সঙ্গে মিশেছে সরসতা। যে-কোনও পরিস্থিতির কৌতুকময় দিকটি অনুভব করবার মতো সজীব মন ছিল বিবেকানন্দের। উপযুক্ত ভাষাও তিনি গড়ে নিয়েছিলেন অক্লেশে।

কলকাতা বন্দর থেকে প্রথমে মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) যাত্রা করেছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর যাত্রাসঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং নিবেদিতা। সঙ্গে ছিল গঙ্গাজলের পাত্র। জাহাজ সমুদ্রে পড়লে রাত্রে বিবেকানন্দ দেখলেন পাত্রটি তরঙ্গভঙ্গে সবেগে আন্দোলিত হচ্ছে। এই দৃশ্য বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন—

"কিন্তু কি একটা অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মাকে প্রবেশ করিয়েছ ভায়া। ... যা হোক, খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদ্‌নাকার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেটা ভেদ করে মা বেরুবার চেষ্টা করছেন। ভাবলুম সর্বনাশ, এইখানেই যদি হিমাচল-ভেদ, ঐরাবত ভাসান, জহ্নুর কুটির ভাঙা প্রভৃতি পর্বাভিনয় হয় তো—গেছি। স্তবস্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম—মা! একটু থাক, কাল মাদ্রাজে নেমে যা করবার হয় কোরো, সে দেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটির, আর ওই যে চকচকে কামানো টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল তো ওর কাছে মাখন, যত পার ভেঙো, এখন একটু অপেক্ষা কর।" গঙ্গাজল প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বাচনভঙ্গিতে যে সরস কৌতুকের সুর তাতে ভক্তির আতিশয্য বা গাম্ভীর্য অনুভব করা যায় না। দক্ষিণদেশীয় ভক্তদের সম্পর্কে যে পরিহাসময় উক্তি এবং গঙ্গাজলকে বদ্‌নাজাতীয় পাত্রে রাখার উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে-কোনও বিষয় বা প্রসঙ্গ নিয়ে রসিকতা করবার মতো স্বচ্ছ মন ও দৃষ্টি ছিল বিবেকানন্দের। ভক্তিরসের আড়ম্বর বা সংস্কার সেখানে কোনও বাধাই সৃষ্টি করেনি। বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা ছিল অন্তরের শক্তি, তুচ্ছ আচার-সংস্কারের বন্ধন নয়।

পরিবেশ বর্ণনার এই সরস দৃষ্টির আলো কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে তার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। জাহাজ থেকে হাঙর শিকারের বেশ প্রশস্ত এক বর্ণনাংশ আছে। হাঙরের জন্য জলে ফেলা হয়েছে টোপ। 'ভীষণ' একটি বঁড়শি জোগাড় হল, যেটিকে বলা যায় 'কুয়োর ঘটি তোলার ঠাকুরদাদা'। তাতে সেরখানেক মাংস আর ফাতনার কাঠ বেঁধে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। হাঙর আসছে একটি দু'টি করে মাংসের লোভে। জলের মধ্যে দুলছে কালো মাংস খণ্ড; জলের উপর ভাসছে চর্বির তেল; সূর্যালোকে সেই ভাসমান স্নেহ পদার্থের শরীরে নানা রঙের খেলা। বিবেকানন্দের বর্ণনা —

"... আগে আগে চলেছেন 'পাইলট ফিস', আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাবড়া'; তাঁর আশেপাশে নেত্য করছেন 'হাঙ্গর-চোষা' মাছ। আহা ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক ঝিক করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত দূর ছুটেছে তা 'থ্যাবড়াই' বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল, জরদা—এক জায়গায়! আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!"

এক তাল 'আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস'-কে জলকেলিরত কৃষ্ণ, আর শুয়োরের চর্বির ধারা সমূহে রঙিন বেশ পরিহিত গোপীদের সঙ্গে তুলনা করবার মধ্যে ঔপম্য-সাদৃশ্যের অভিনবত্বের দিকটিও যেমন ভোলা যায় না; তেমনই অবাক হতে হয় লেখকের সংস্কারমুক্ত মনের সাহস দেখে। শূকর মাংসের সঙ্গে কৃষ্ণের তুলনার ছবি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশ করতে কোনও দ্বিধাও জাগেনি তাঁর মনে। বিবেকানন্দের মনে আরোপিত সংস্কারের কোনও স্থান ছিল না। তিনি হয়তো মনে রেখেছিলেন—কৃষ্ণেরই অবতার বলে শূকর স্বীকৃত এবং শূকর-মাংস গ্রহণ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতে উচ্চবর্ণের মানুষের কোনও বাধাই ছিল না।

ইতিহাস-ভূগোল-নৃতত্ত্ব-ধর্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান-দর্শন সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান, মনীষা ও ভাবনার প্রকাশ আছে এই গ্রন্থে—উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে তার পরিচয় দান থেকে বিরত রইলাম। যথেচ্ছ পৃষ্ঠা উল্‌টে বলা যায়—প্রাচীন গ্রিস ও রোম-এর ইতিহাস-প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনই জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক, হাঙ্গেরি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে যে কূটনৈতিক সম্পর্ক-জটিলতা দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ক্রমেই বেড়ে উঠছিল তার অসাধারণ বিশ্লেষণ করেছেন বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে।

আবার সমকালের ইউরোপীয় গায়ক, নর্তক, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, ধর্মযাজক—সকলের সম্পর্কেই প্রাসঙ্গিক মন্তব্য আছে। কোথাও এমন অনুভূতি হয় না যে, ধর্মযাজকের কাজের সঙ্গে সঙ্গীত-শিল্পী, নৃত্য-শিল্পী, মঞ্চাভিনেতৃবর্গের জীবিকাকে তুলনায় তিনি কোথাও ছোটো করেছেন। একই মর্যাদায় সর্ব শ্রেণির, সব পেশার মানুষকে দেখা—বিবেকানন্দের বিশেষ মনঃশক্তি ছিল।

কখনও বর্ণনার সৌন্দর্য-দৃষ্টি প্রসারিত দেখতে পাই—সমুদ্রের চিত্রাঙ্কনে, ফরাসি প্রাসাদের বিবরণে। কখনও ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার পাশাপাশি দরিদ্র ভারতের রিক্ততার কথা মনে পড়ছে তাঁর। প্রাচীন ভারতের অতীত-গৌরব গাথা বিবেকানন্দের মনকে কোনও সান্ত্বনা দিতে পারছে না। তিনি বিজ্ঞান-সম্মেলনে জগদীশচন্দ্র বসুর কৃতিত্বের সম্মানে গর্ব বোধ করছেন—"আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে.সি. বোস!"

এই অংশের ভাষার দৃষ্টান্তেও—আমরা আর একবার বলতে চাই, চলিত বাংঙলাকে—সর্বভাব প্রকাশ-পারঙ্গম সক্ষমতায় একা বিবেকানন্দই উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন।

আমরা দৃষ্টান্ত আর জমিয়ে তুলব না। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোচনা—ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দিক;নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান নিয়ে সাগ্রহ বিশ্লেষণ ইত্যাদি থেকে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বকে এই 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে যে পূর্ণতায় চেনা যায়, তেমন আর কোনও লেখাতেই হয়তো যায় না।

ভারতের ধর্মচর্চার ধারা অনেক;বৈচিত্র্যও অনেক। কিন্তু বিবেকানন্দ ভাবনার, কর্ম-প্রেরণার এবং ব্যক্তিত্বের যে ঐশ্বর্য-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজের জায়গাটি অর্জন করেছিলেন এবং আজও সেই জায়গায় তিনি স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত—সেই জায়গাটিতেও এই গ্রন্থে আলো পড়েছে বারবার। তেমনই একটি অংশ উদ্ধৃত করে 'পরিব্রাজক'-এর আলোচনা আমরা শেষ করব—

"এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, —তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, —তাতে পেয়েছে অটল জীবনশক্তি।

এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।"

এ-ই ছিল জীবন-পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের উপলব্ধি।

উদ্বোধন পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ (১৩০৬-১৩০৮ বঙ্গাব্দ) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' শীর্ষকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রকাশ ১৯০৩-এ। প্রধানত দুই সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনাই বিবেকানন্দের সরল উদ্দেশ্য। তবে লেখকের উদ্দেশ্য উদ্ভূত হয় সমকালের জীবন-ভাবনা ও ঔচিত্যবোধ থেকে। মোটের উপর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু বাঙালির মানসিকতা ও দৃষ্টিকোণ থেকেই জেগেছিল বিবেকানন্দের এই তুলনামূলক বিচারবুদ্ধি। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। বিভিন্ন সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও লোকাচার সম্পর্কেও ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে যেহেতু সমাজ-পরিমণ্ডল সম্পর্কে লেখকের ভাবনা ও বিশ্লেষণের দিকটিই প্রধান সে কারণে ভ্রমণ-সাহিত্য 'পরিব্রাজক'-এর মতো সরসতা বা একান্ত নিজস্ব শিল্পময় দৃষ্টি-সম্পাতের সেখানে অভাব। সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং ইতিহাসের পশ্চাৎপট সম্পর্কে লেখকের আলোচনা বিস্তৃত এবং সুচিন্তিত ভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই রচনা-মালায়। ধর্ম ও মোক্ষ, জাতি ধর্ম, শারীরিক বিশিষ্টতা, পোশাক ও ফ্যাশন, আহার ও পানীয়, পরিচ্ছন্নতা, আর্যজাতির পরিচয়, নারী ও পুরুষের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আছে আলোচনা।

যেহেতু সমস্ত লেখাটিই চিন্তামূলক তাই বিবেকানন্দের বুদ্ধিবৃত্ত ভাবনার দিক, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামতই এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে শিক্ষিত বাঙালির মনোভাবে মোটের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার সদ্‌গুণের স্বীকৃতির সঙ্গে স্বাদেশিকতা বোধের সমন্বয় ছিল। সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের বাণিজ্য বুদ্ধির স্বার্থপরতা, শাসন-পদ্ধতির একদেশদর্শিতার দিকও তাঁরা ভালোই বুঝতেন। স্বদেশপ্রেম ও ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি-ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও খোলা চোখে ভারতীয় চরিত্রের যে পশ্চাৎমুখীনতা, কুসংস্কার, আলস্য, কর্মে উৎসাহের অভাব ইত্যাদি ত্রুটি দেখা যায় তার প্রতিও সমালোচনা-মুখর ছিলেন তাঁরা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র—ব্যতিক্রম ছিলেন না কেউ-ই। এই মনোভাবের শরিক ছিলেন বিবেকানন্দও। সে জন্যই তাঁর লেখায় ব্যঙ্গ ও পরিহাসের সুরে ভারতীয় চরিত্রে স্খলন এত স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেন তিনি।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটি সম্পর্কে আরও একটি কথা বলবার থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই কেবল ভারতীয় ও ব্রিটিশ জাতির আলোচনায় আবদ্ধ থাকেননি তিনি। প্রধানত ভারতীয়দের নিয়ে কথা বললেও কিছুটা চীনা ও জাপানি; আরব ও তাতারদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে গ্রিস থেকে আয়ারল্যান্ড—বাদ যায়নি কেউই। জার্মানি, ফ্রান্স, তো আছেই। লেখকের আহরিত জ্ঞান—ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব সহযোগে সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট মন্তব্যে আলোরশ্মির মতোই সমুজ্জ্বল। সর্বত্র অবশ্য এখন আমরা বিবেকানন্দের সঙ্গে একমত হতে পারি না। যেমন বর্ণাশ্রম-প্রথা সম্পর্কে তাঁর কথায় স্ববিরোধ আছে। আর্যদের অবস্থান

ও অন্-আর্যদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর অভিমত এখন আর গ্রাহ্য হবে না। তবে তাঁর কালগত পরিমণ্ডলও মনে রাখতে হবে আমাদের। এবং বলা যায়, এসব বিষয়ে বিতর্ক এখনও চলতে পারে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটি যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে পাশ্চাত্য দেশের পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস এবং শিল্পের প্রসঙ্গে এসে। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের প্রশংসায় বিস্ফারিত হয়েছেন। যা ফেলবার তা যে তারা কখনও রাস্তায় ফেলে না—এই সত্যটি এদেশে আজও স্বীকৃত হল না।

ইউরোপীয় শিল্পকলা সম্পর্কে মুগ্ধতা বিবেকানন্দের শিল্পবোধের সূক্ষ্মতা এবং শিল্প-উপভোগ-ক্ষমতার গভীরতা প্রমাণ করে। যদি চাইতেন তাহলে তিনি বড়ো মাপের কলা-সমালোচকও হতে পারতেন। শেষ অংশটির কয়েক ছত্র উদ্ধার করছি।

"ওদের মতো চিত্র বা ভাস্কর্য-বিদ্যা হতে আমাদের এখনও ঢের দেরি! ও দুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। ... বড্ড জোর ওদের (ইউরোপীয়দের) নকল করে একটা আধটা রবি বর্মা দাঁড়ায়!! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাছে তবু ঝকমকে রঙ আছে। ... ইউরোপী ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতির কথা বারান্তরে উদাহরণ সহিত বলবার রইল। সে এক প্রকাণ্ড বিস্ময়।"

বোঝাই যায়—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' যেখানে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে সেখানে শেষ হবার কথা ছিল না। ইউরোপীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা সম্পর্কে বিবেকানন্দের বিস্তৃততর মতামত জানতে পারলে তাঁর বহুমুখী চিত্তের শিল্প-মনস্কতার আরও একটি দিক খুলে যেত আমাদের সামনে।

'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩০৫ থেকে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের লিখনগুলি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৫-এ স্বামী সারদানন্দের সম্পাদনায়। এই বইটি কিছু ভারি ধরনের। ভারতের ইতিহাস, ধর্মীয় দর্শন ও মুক্তচিন্তার দর্শনের বহু হাজার বছরের পরম্পরাকে অল্প পরিসরে জমাটভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন লেখক। এই সংস্কৃতিধারা কীভাবে বর্তমান ভারতের রূপ পরিগ্রহ করেছে তা-ই দেখাতে চেয়েছেন তিনি। দেখতে পাই, এই লিখনগুলির ভাষা সাধু বাঙলা। বিষয়বস্তুর চরিত্র ও গাম্ভীর্যের কথা ভেবেই সম্ভবত সাধু বাঙলা ব্যবহার করেছেন বিবেকানন্দ। কিন্তু 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের নিবন্ধগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে খুব বেশি আকর্ষক মনে হয়নি। সেই সঙ্গেই বলা যায় এই গ্রন্থেরই উপসংহার অংশ 'স্বদেশ মন্ত্র' সম্ভবত বিবেকানন্দের সর্বাধিক প্রচারিত বাণী—সেই "হে ভারত ভুলিও না..."।

ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধরনের শ্রেণির অস্তিত্ব, তাদের অন্তর্বর্তী সংঘাত এবং সভ্যতার গতি যে এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই চলমান—সেই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, মার্কসীয় বীক্ষণ সম্পর্কে বাঙালির কোনও ধারণাই তখন ছিল না। বলা যেতে পারে, যে সমাজ-সত্য মার্কস্‌কে তাঁর চিন্তনের দিকে প্রণোদিত করেছিল—সেই সত্যই বিবেকানন্দকেও দিয়েছিল এই শ্রেণি-সচেতন দৃষ্টিকোণ। বৈশ্য যুগের শেষে শূদ্র যুগের অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত স্পষ্টভাবেই এখানে দিয়েছেন বিবেকানন্দ।

নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গীয় শ্রেণির অত্যাচারের কথা এত স্পষ্টভাবে সম্ভবত বাঙলা ভাষায় এর আগে উচ্চারিত হয়নি। — "সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্য প্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' ভয়াল দন্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই চলমান মশাল, ভারতেতর দেশের 'ভারবাহী পশু' সে-শূদ্রজাতির কি গতি?" তখন বিবেকানন্দের এই উক্তি নিয়ে কিছু বিরোধিতাও হয়েছিল।

বিবেকানন্দ একথা উচ্চারণ করবার একশো বছর পরেও ভারতে শূদ্রের হীনতর অবস্থান অতীত ঘটনা হয়ে যায়নি। সেদিন, উনিশ শতকের শেষ লগ্নে বিবেকানন্দ বলেছিলেন— "ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!" এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটিকে সেই সময়ের বিপ্লবের সাহিত্য বলা যেতে পারে।

বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য নিয়েও লেখা যেতে পারত কিছু কথা কিন্তু সে প্রয়াসে বিরত থাকছি। তার কারণ সাহিত্যিক যখন পাঠককুলের অস্তিত্ব স্মরণে রেখে কিছু লেখেন তখন সচেতনভবে নির্মাণ করেন শিল্পিত বাক্। পত্রের শৈলীতে অনেক নিবন্ধ ও ভ্রমণকথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি জানতেন সেগুলি ঠিক ব্যক্তিগত চিঠি নয়, মুদ্রিত হয়ে বহু পাঠকের সামনে আসবে অচিরেই। তাই সেসব চিঠি পত্র-সাহিত্য হয়ে উঠেছিল সচেতন ভাবে। বিবেকানন্দ তেমন কোনও পরিস্থিতিতে পত্র-প্রবন্ধ রচনা করেননি। তেমন কোনও ভাবনাও তাঁর ছিল না। তাঁর চিঠি সোজাসুজি চিঠি। সাহিত্য রূপে সেগুলিকে এখানে আমরা দেখছি না। যদিও স্বাভাবিক প্রবণতা-বশতই হৃদয়াবেগের পূর্ণ প্রকাশমুখ হয়ে ওঠায় তাঁর চিঠিগুলি মাঝে মাঝেই সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

আমরা শেষে একবার অনুভব করব কবি বিবেকানন্দকে। সংখ্যায় অনেক কবিতা তিনি লেখেননি। কিন্তু লিখেছেন চারটি ভাষায়—সংস্কৃত, ইংরেজি, হিন্দি ও বাঙলা। সব মিলিয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে তাঁর কবিতার সংখ্যা। কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ কবিতাবলির কোনও পৃথক সংকলন নেই। কবি বলে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতেও চাননি। বরং প্রাবন্ধিক রূপে, গদ্যকার রূপে আত্মপ্রকাশ করবার প্রয়াসী তিনি ছিলেন। কিন্তু প্রাণের আবেগে, হৃদয়োচ্ছ্বাসের উৎসারিত স্রোতকে রুদ্ধ না করে তিনি মাঝে মাঝে কিছু কিছু কবিতা লিখেছেন। বিভিন্ন ভাবে সেগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রক্ষিত হয়েছে। আরও একথা কথা মনে হয়, গদ্য সাহিত্যিক বিবেকানন্দ প্রধানত মননশীল চিন্তক। ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্ব, দর্শন-শাস্ত্র, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, জীবনের বিচিত্র স্বাদ তাঁর মনে যে ভাবনা-তরঙ্গ জাগিয়েছে তাকেই তিনি গদ্য-নিবন্ধে সচেতনভাবে প্রকাশ করেছেন। গদ্য-সাহিত্যে ধর্মকথার লেখক তাঁকে কেউ বলবে না। কিন্তু কবিতায় বিবেকানন্দ অধ্যাত্ম অনুভবকে পূর্ণ মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অবলম্বন আপাতভাবে কখনও কখনও শিব, কালী, কৃষ্ণ। কিন্তু আসলে সৌরলোকের স্থপতি; বিশ্ব-বিধায়ক ও ব্রহ্ম-স্বরূপ ঈশ্বরের পরম সৃষ্টি এই আশ্চর্য বিস্ময়-জাগানো মহাবিশ্বের অনুভূতিই তাঁর কবিতার নিহিত প্রেরণা। তাঁর অনেক কবিতাই স্তোত্র এবং সঙ্গীত রূপে রচিত। এখানে কবিতার আলোচনায় গান-কবিতা-স্তোত্রের কোনও পার্থক্য করা হয়নি।

বিবেকানন্দের সংস্কৃত রচনাগুলি 'বীরবাণী' নামে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (উদ্বোধন কার্যালয়)-র ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত (১৯৬২)। রামকৃষ্ণদেবকে নিবেদিত আটটি শ্লোক, ছয়টি শিবস্তোত্র, সাতটি অম্বা-স্তোত্র সংকলিত। স্তোত্রগুলি ঠিক কবে রচিত তা উল্লিখিত নেই। রামকৃষ্ণ স্তোত্রের মধ্যে যেটি সর্বাধিক দীর্ঘ—আট চরণ—তার প্রথম দু'টি ও শেষ দু'টি চরণ উদ্ধৃত হল —

অচন্ডাল প্রতিহতরয়ো যস্য প্রেম প্রবাহঃ
লোকাতীতোইপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।

গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্।।

আগ্রহী পাঠককে শ্লোকগুলি দেখে নিতে অনুরোধ করব। সংস্কৃত ভাষার উপর কতখানি অধিকার থাকলে স্বচ্ছন্দ মৌলিক শ্লোক রচনা করা যায় তা সহজেই অনুমেয়।

সাতটি অম্বাস্তোত্র একত্রে নিয়ে বিবেকানন্দ একটি বাঙলা অনুবাদ-কবিতা রচনা করেছিলেন দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে। তার কিছু অংশ —

তুলি ঘোর ঊর্মিভঙ্গে মহাবর্ত তার সঙ্গে,
এ ভবসাগরে কে মা, খেলিতেছ বল না?
শিরময়ী মূর্তি তোর শুভঙ্করী, একি ঘোর,
সুখ দুঃখ ধরি করে কর সবে ছলনা।

আগে বলা হয়েছে রাগাশ্রিত সঙ্গীতে আগ্রহ ছিল বিবেকানন্দের। এ-জাতীয় ভক্তিগীতি হিন্দি ভাষায় অনেক শোনা যায়। তেমন কয়েকটি শিব-সঙ্গীত ও কৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তিনি। সুরে স্থিত বলে কবিতার ছন্দের নিরূপিত মাত্রা-বিভাজন এগুলিতে প্রত্যাশিত নয়। দু'টি উদাহরণ —

১. হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপানি।।
ঊর্ধ্ব জ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী।।
(তাল—সুর ফাঁকতাল)

২. মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া, যানেকো দে।
যানেকো দে রে সেঁইয়া, যানেকো দে।
মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুহারি
ছোড়ে চতুরাই সেঁইয়া, যানেকো দে।
(মূলতান—ঢিমা ত্রিতালী)

বিবেকানন্দের বাংঙলা কবিতাগুলির অধিকাংশই উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষভাবে এই কবিতাগুলিতেই মহাবিশ্বের বিস্ময় উদ্ভাসিত হয়েছে। যেমন—'সৃষ্টি' - "একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত আগামী-কাল-হীন, / দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।।" এমনই আর একটি কবিতা —

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।।

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৮৯৮-৯৯) দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'সখার প্রতি' নামের কবিতা। 'সখা' সম্বোধন তিনি করেছেন পাঠককে, জনগণকে। এই কবিতারই শেষ দুই চরণ নিয়ে উঠেছে তাঁর প্রবাদোপম বাণী—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় জীবনের কঠিন ও রুদ্র রূপের মধ্যে মাতৃকা-রূপের সঞ্চার ও সেই কঠিনকে চিত্তের বিশুদ্ধতায় আহ্বান করে নেবার সংকল্প। 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' নামের কবিতাটি 'উদ্বোধন' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যায় (১৯০১-২) প্রকাশিত। কবিতাটির সহায়ক টীকায় সম্পাদক জানিয়েছেন যে, গাজিপুরে এক যোগীর কাছে যোগ শিক্ষার জন্য বিবেকানন্দ অবস্থান করেছিলেন। সেখানেই সহসা রামকৃষ্ণ তাঁকে দিব্য আলোকে দেখা দেন। তখনই তিনি স্থির করেন যে রামকৃষ্ণ-দেবই তাঁর গুরু। সেই উপলক্ষ্যেই কবিতাটির উৎসার। এই উপলক্ষ্য নিশ্চয়ই সত্য। কবিতাটিতে গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ-সূচক কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আছে। কিন্তু দীর্ঘ কবিতাটিতে মূলত অনন্ত মহাবিশ্ব, জীবনমৃত্যুর বিরামহীন আবর্তন সংক্রান্ত অনুভূতিই বড়ো হয়ে উঠেছে। একাধিক স্তবকে কবি 'আমি বর্তমান' বলে শুরু করেছেন তাঁর কাব্যভাষা। একটি স্তবক উদ্ধৃত করা হল। —

" আমি বর্তমান।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
প্রলয়ের কালে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
সে মহানির্বাণ, নাহি কর্ম করণ কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার-বুকে,
আমি বর্তমান।"

কবিতাটির শেষ স্তবক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যেখানে কবি বিবেকানন্দ সম্ভবত গুরু রামকৃষ্ণদেবকে বিস্মৃত হয়ে স্রষ্টা কবিরূপে এই সৌরমণ্ডলে নিজেকে স্রষ্টা ঈশ্বরের সমরেখায়

স্থাপিত করেছেন। কবিরা এই আপাত-স্পর্ধিত বাণী মাঝে মাঝেই উচ্চারণ করেন। বস্তুত, এ তাঁদের স্পর্ধা নয়। এ হল জগৎ ও জীবনের সঙ্গে কবি সত্তার অবিচ্ছিন্ন মিলন-উপলব্ধির স্ফুরণ।

" আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড় জীব আদি যত।
মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জে মেঘ অশনি-নিনাদ;
মৃদুমন্দ মলয়-পবন
আসে যায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে;
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরাবপু;
তোলে মুখ শিশির মার্জিত
ফুল ফুল রবি-পানে।"

বিবেকানন্দের রচিত ইংরেজি কবিতাগুলিই সর্বাধিক পরিচিত। তার মধ্যেও বিখ্যাততম হল 'কালী, দ্য মাদার' (Kali, the Mother)। কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী মন্দিরে বসে এটি রচনা করেছিলেন বিবেকানন্দ। সেই রচনা-সময়ের পরিবেশটি জানা যায় নিবেদিতার স্মৃতিচারণ থেকে—"His brain was teeming with thoughts, he said one day and his fingers would not rest till they were written down. It was that same evening that we came back to our houseboat from some expedition and found waiting for us. Where he had called and left them, his manuscript lines on 'Kali, the Mother'. Writing in a fever of inspiration, he had finished—as we learnt afterwards—exhausted with his own intensity."

('The Master as I saw him' : 1910,
Quoted from 1983 edition: P. 107)

এই সময়ে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের পরিপূর্ণ অনুগামী কেবল নন, মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা—যেখানে স্থাপিত হয়েছেন মহাশক্তি রূপিনী দেবী কালিকা। বিবেকানন্দের কাছে সেই মূর্তি ঠিক স্নেহময়ী জননীর প্রতীক নন। এখানে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর উপলব্ধির পার্থক্য আছে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কেন্দ্রে বিরাজিত মৃত্যুরূপিনী মহাশক্তিকে অনুভব করা হয়েছে এই কবিতায়। এই প্রচন্ড প্রলয়-শক্তিকে সহ্য করতে পারলে, ধারণ করতে পারলে তবেই জীবের সাধনা সফল। অসাধারণ চিত্রকল্প নির্মাণ করে নিজের উপলব্ধি ফুটিয়ে তুলেছেন বিবেকানন্দ—

"The Stars are blotted out
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant

In the roaring, whirling wind,
Are the souls of a million lunatics
Just loosed from the prison house,
Wrenching trees by the roots
Sweeping all from the path."

"Who dares in destruction's dance,
And hug the form of death—
To him the Mother comes.

অনেকেই মনে করেছেন তাঁর ইংরেজি কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল 'দ্য কাপ' (The Cup)। শ্রেষ্ঠতার বিচারে না গিয়েও কবিতাটিকে খুবই উল্লেখযোগ্য বলতে হবে কারণ খ্রিস্টীয় ধর্মানুষঙ্গের সংকেতবাহী পেয়ালার প্রতীকটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। খ্রিস্ট-ধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের আগ্রহ ও অধ্যয়নের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। যিশুখ্রিস্টের পবিত্র পেয়ালা—পরম পুণ্যের আধার এই পানপাত্রটিকে বিশেষভাবে সংরক্ষিত রাখতে হবে। এই প্রতীকে পেয়ালা হয়ে ওঠে ভক্তের হৃদয়-পাত্র এবং জীবন-পাত্রের কল্পমূর্তি। দুরূহ ব্রত সফল হবে ওই পানপাত্র থেকে ত্যাগ ও ভক্তি-স্বরূপ পানীয় গ্রহণ করলে। এই 'পবিত্র কাপ' বা পেয়ালা নিয়ে বিশ্ব সাহিত্যে বহু অনুষঙ্গবাহী প্রতীক ও চিত্রকল্প রচিত হয়েছে। বিবেকানন্দের রচিত কবিতাটি এভাবেই বিশ্ব সংস্কৃতিকেও বিম্বিত করে। কবিতাটি থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হল। বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম ভাবনা কেবলই হিন্দুর কালীপূজা নয়। তাঁর আধ্যাত্মিকতার বোধ এক বৈশ্বিক কল্পনা। তা সর্বমানবীয় সত্য —

"This is your cup—the cup assigned
to you from the beginning.
Nay, My child, I know how much
of that dark drink is your own brew
Of fault and passion..."

বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হলেও দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী; স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌বোধিত সন্ন্যাসী, তাই তিনি দেশ ভাবনার কবিতাও কিছু লিখেছিলেন। উল্লেখযোগ্য কবিতা 'টু দ্য ফোর্থ অভ্ জুলাই'। আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের স্মরণে রচিত এই কবিতা কয়েকজন আমেরিকান বন্ধুকে উদ্দেশ করে লেখা। জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিবেকানন্দের কাছে এই দিনটি বিশ্বমানবের মুক্তির দিন বলেই গণ্য হয়েছিল।

ইংরেজি কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর দার্শনিক উপলব্ধি, আধ্যাত্মিক অনুভব, জীবনের বাস্তবতা, আন্তরিক কর্তব্য বোধ, আত্মোপলব্ধির বিশালত্বের বোধ—সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য বিপুল সমন্বয়িত উপলব্ধি গড়ে ওঠে। তেমনই একটি কবিতা—'দ্য সঙ্ অফ্ দ্য সন্ন্যাসিন্'।

"There is but One—The Free—The Knower—Self

without a name, without a form or stain
In Him Maya dreaming all this dream,
The witness, He appears as nature, soul
Know thout art That, Sannyasin bold!—

No more is birth,
Nor I, nor thou, nor God, nor man. The "I"
Has all become, the All is "I" and Bliss
Know thou art That, Sannyasin bold. Say—
Om Tat Sat, Om!"

'টু দ্য অ্যাওয়েক্‌ন্‌ড্ ইনডিয়া', 'সঙ্ অফ্ দ্য ফ্রি', 'টু মাই ওউন সোল' — ইত্যাদি কবিতাও উল্লেখ্য। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রগাঢ় গাম্ভীর্যকে কবিতার আবেগময় অনুভব করে তোলার এরপর আর প্রুফ নেই। দৃষ্টান্ত বাঙলা সাহিত্যে বেশি নেই। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সঙ্গীতে এই ভাবনা আছে কিন্তু গীত-লালিত্যে তা অতিরিক্ত মধুর রূপে প্রকৃত গাম্ভীর্য কিছুটা হারায়। বিবেকানন্দের পর পন্ডিচেরির নিশিকান্ত রায়চৌধুরী ও দিলীপকুমার রায় এই ভাবের গান-কবিতা কিছু লিখেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহেই আধুনিক ভারতের নির্মাতাদের একজন। তাঁর সাহিত্যেও তিনি সেই পরিচয় রেখে গেছেন। আবারও বলব—আর কোনও কাজ না করলেও তিনি সাহিত্যিক রূপে মান্য হয়ে থাকতেন। কিন্তু জীবনের অন্য কাজগুলি না করলে যে-সাহিত্য তিনি রচনা করেছেন তা রচিত হতে পারত না। বিবেকানন্দের জীবন ও সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক।